প্রথম আলো

ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

০৫ নভেম্বর ২০১৭, ১২ :৪২

স্যার ফজলে হাসান আবেদ, প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন, ব্র্যাক ছবি : প্রথম আলো

আমরা নিজেদের রাষ্ট্র পেয়েছি ১৯৭১ সালে। এর আগে রাষ্ট্র নামে জাতির এই বৃহত্তম সংগঠনটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোও হয়ে থেকেছে নির্জীব ও ফ্যাকাশে। ব্রিটিশ আমলের একেবারে শেষ আমলেও কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রিটে 'কমলালয়' জাতের একটা বড়সড় কাপড়ের দোকান করতে পারাকেই বাঙালির ব্যবসা-প্রতিভার সর্বোচ্চ উদাহরণ বলে মনে করা হতো।

বাঙালিরা সংগঠন গড়ে তোলার প্রথম সুযোগ পায় একাত্তরের স্বাধীনতার পর—জাতির ভাগ্য-নির্ধারণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে এলে। শুরু হয় বাঙালির সংগঠনের যুগ। স্বাধীনতার পর দেশে নৈরাজ্য ও হত্যাকাণ্ডের যে রোমহর্ষ শুরু হয়, সে পর্ব এড়িয়ে আমাদের বাণিজ্যিক ও অন্য সংগঠনগুলোর সূচনা ঘটতে দশক দেড়েক দেরি হলেও একধরনের দেশপ্রেমিক মানুষের সংগঠন—দেশের জরুরি প্রয়োজনের তাগাদায় এই বিপর্যয় ও রক্তাঘাতকে এড়িয়েই—যাত্রা শুরু করে দেয়। এগুলো একধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

সংগঠন। এরা ছিল দেশাত্মবোধে জাগ্রত। কল্যাণপ্র তাদের কর্মোদ্যোগ দেশের ওই বৈরী পরিস্থিতিকে

অশ্রুভারাক্রান্ত করেছিল, এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তাঁরা সেই দুঃখের প্রতিকার খুঁজেছিলেন। তাঁরা এক অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যমুক্ত মর্যাদাবান ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

২.

এই ধারার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি জন্ম নেয় স্বাধীনতাযুদ্ধের মাঝখানেই, কলকাতায়। এটি একটি প্রকাশনা সংস্থা, নাম মুক্তধারা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এর স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বৌদ্ধিক সমৃদ্ধির বিপুল স্বপ্ন নিয়ে প্রায় মত্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন এবং তাঁর পাঠ্যবই ও নোটবই বিক্রির প্রতিষ্ঠান 'পুঁথিঘর' অর্জিত বিপুল অর্থ প্রায় পুরোপুরি এর পেছনে নিঃশেষ করে দেন।

এরই কোনো একপর্যায়ে একদিন তিনি বাংলা একাডেমির বটগাছের নিচেও বই বিছিয়ে বসে যান মেলা করতে। সেই মেলাই আজকের বাংলা একাডেমির বিশাল বইমেলা।

চিত্তরঞ্জন সাহা তাঁর স্বপ্ন পূরণে কতটা সফল হয়েছিলেন সে বিচার আমি করব না। এসব করে লাভও হয় না। কিন্তু তিনি যে একটা বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, এটাই বড় কথা।

৩.

প্রায় একই সময়ে, স্বাধীনতার ঠিক পরের বছরেই, এই নিঃস্ব-নিরন্ন দেশটির বাস্তব সমস্যা ও দুঃখ-দৈন্যের জবাব দিতে জ্বলে ওঠে আরেকটি প্রতিষ্ঠান—ব্র্যাক। মুক্তধারার মতো এই প্রতিষ্ঠানটিও স্বাধীনতাযুদ্ধের ফসল। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সামনে যে দারিদ্র্য-বৈষম্যহীন সম্পন্ন জাতির স্বপ্ন এনে দাঁড় করিয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠানটি হতে চেষ্টা করেছিল সেই স্বপ্নের সহযাত্রী। ব্র্যাক প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ আমাদের সমাজে এই স্বপ্নের অন্যতম সফল রূপকার।

স্বাধীনতার পর দেশের অনেকেই যখন নিজ নিজ পাওনা আর হিস্যা নিয়ে কাড়াকাড়িতে মত্ত, সেই সময় এই নিভৃতচারী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন মানুষটি তাঁর লন্ডন শহরের ছোট্ট ফ্ল্যাট বিক্রি করার টাকা ও একজন বন্ধুর (ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী) সামান্য কিছু টাকা নিয়ে সুনামগঞ্জের যুদ্ধনিপিষ্ট শাল্লা এলাকায় গিয়ে নিঃস্ব মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টায় নেমে পড়েন। এর বছর দুয়েক পর ১৯৭৪ সালে উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চলে যান রংপুরের রৌমারী এলাকায়। এরপর মানিকগঞ্জে। এভাবে ক্রমাগত বড় হতে হতে ব্র্যাক একসময় হয়ে ওঠে দেশের গ্রামাঞ্চলের দুস্থ-দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের দেশব্যাপী এক বিশাল কর্মসূচি।

ব্র্যাক আজ পৃথিবীর বৃহত্তম এনজিও। ব্র্যাক নামটির সঙ্গে 'বৃহত্তম' শব্দটি হেলাফেলায় এসে জুড়ে যায়নি। ফজলে হাসান আবেদের বিস্ময়কর সাংগঠনিক প্রতিভা, সহজাত কাণ্ডজ্ঞান ও উঁচু মাপের কর্মোদ্যমই একে

সম্ভব করেছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজে গ্রামবাংলায় ঘোরার সময় ব্র্যাকের বেশ কিছু কার্যালয় দেখার সুযোগ আমার বার কয়েক হয়েছে। সেসব জায়গায় দেখেছি কীভাবে দাঁতে দাঁত চেপে অসংখ্য ছোট-বড় জটিল চাকা নিয়ে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে তাঁর এই অদমিত অতিকায় সংগঠনযন্ত্রটি! জাপানিরা যাকে বলে 'জিরো ডিফেক্ট', ঠিক যেন তারই উপমা। হয়তো এত বড় একটা যন্ত্রকে চলতে হলে এমনই নির্ভুল আর কঠোর না হলে চলেও না। পুঁজিবাদী সভ্যতার চরমোৎকর্ষের প্রতীক যেন এই সংগঠন—ওই সভ্যতার শক্তিমত্তা আর উদ্ভাস দিয়ে তৈরি। তবু ফজলে হাসান আবেদ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের যক্ষপুরীর রাজা নন। কেননা মাটির তল থেকে উপড়ে তোলা সোনার তাল তাল চাঁই দিয়ে কুবেরের উদ্ধত প্রাসাদ তৈরি করা এর লক্ষ্য নয়, এর পেছনে রয়েছে এক অতিকায় মানবকল্যাণের স্বপ্ন—যার পেছনে রয়েছে এর প্রতিষ্ঠাতার ব্যথিত অবোধ ভালোবাসায় ভরা একটি মমতা মাখানো হৃদয়।

এক নিমন্ত্রণে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে একদিন কথা হয়েছিল। তাঁর কাছে ব্র্যাকের বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখার অভিজ্ঞতার কথা বললে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন দেখলেন?

হেসে বলেছিলাম, সবই ভালো। কিন্তু প্রেমের চেয়ে কঠোরতা একটু বেশি চোখে পড়ল। মৃদুভাষী আবেদ বললেন, এটারও হয়তো দরকার আছে।

তাঁর কথা আমি মেনে নিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ব্র্যাকের একটা স্বপ্ন আছে ঠিকই, কিন্তু এ তো আসলে কোনো আন্দোলন নয়। এ তো দুস্থ-দরিদ্র মানুষের মানোন্নয়নের একটা দেশজোড়া বিপুল বহুমুখী কার্যক্রম —চুলচেরা হিসাবের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক অতিকায় কর্মযজ্ঞ। আন্দোলনের স্বপ্নে ভরা উত্তাল প্রগলভতার অবকাশ থাকলে এ কাজ কি চলবে?

৪.

কোনো বিশাল জিনিসই রাতারাতি জন্মায় না। ব্র্যাকের বিশালতাও এক দিনে তৈরি হয়নি। সুচিমুখের মতো তীক্ষ্ম একটি জায়গা থেকে শুরু হয়ে তিলে তিলে এ বড় হয়েছে। কিছুদিন আগে একটা বইয়ে সুন্দর একটা কথা পড়েছিলাম। কথাটা হলো : কখনো ভেবো না একটা সুবিশাল ইমারত বানাব। সব সময় ভেবো : প্রতিদিন সুন্দর করে একটা ইট গাঁথব। এভাবে রোজ একটা করে ইট গেঁথে গেঁথেই জন্ম হয়েছে আজকের ব্র্যাক নামের এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটি। কীভাবে এ এত বড় হলো তার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

অনেকেই জানেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রবর্তক ফজলে হাসান আবেদ। কীভাবে এই চিন্তাটি তাঁর মাথায় এসে ধীরে ধীরে পরিণতি পেয়েছে এটুকু বুঝতে পারলে কীভাবে এই প্রতিষ্ঠান এত বড় হলো তা বুঝতে সুবিধা হবে। তিনি বলেছেন :

'১৯৭৩ সালের ঘটনা।...গ্রুপ ধরে নয়, কেউ কেউ ঋণ চাইলেন একা এসে। একজন এসে বললেন, আমাকে এক হাজার টাকা ঋণ দিলে আমি এই কাজটা করতে পারব। আরেকজন এসে অন্য একটা কাজের কথা বলে ঋণ চাইলেন। অনেককেই তাঁদের চাহিদামতো এক, দুই বা তিন হাজার টাকা ঋণ দিলাম। এই ঋণ দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা চেয়েছেন, আমরা দিয়েছি। কিন্তু এসব ঋণের টাকা ঠিকমতো ফিরে এল না। টাকাগুলো নিয়ে তাঁরা হয়তো খাওয়া-পরার কাজে ব্যয় করে ফেলেছেন। যে

কাজের জন্য নিয়েছিলেন, সে কাজ হয়তো করেননি বা করতে পারেননি।'

তখন তাঁর মনে হলো শুধু শুধু ঋণের জন্য ঋণ দিলে হবে না, প্রতিপদে ব্র্যাককে এই ঋণ-নেওয়া মানুষগুলোর পাশে থাকতে হবে। যে ছোট্ট ব্যবসাটির জন্য তাঁরা ঋণ নিচ্ছেন, সেই ব্যবসার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের এ ব্যাপারে যোগ্য করতে হবে। ব্যবসাটি চালাতে হলে যেসব দ্রব্যসামগ্রী বা উপকরণ দরকার, তা তাঁদের কাছে সুলভ করতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা তো নিতেই হবে, তাতে না কুলালে জাতীয়ভাবে একটা বড় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। কী করে এ কাজ তিনি করেছেন তার একটা উদাহরণ দিই। শুধু মুরগির লালন-পালনের জন্য ব্র্যাক যে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়েছে তাকে সফল করার জন্য ক্রমান্বয়ে দেশের ৪০ হাজার গ্রামে মুরগির ভ্যাকসিন সরবরাহ তাঁকে নিশ্চিত করতে হয়েছে। মুরগির খাদ্যের দরকার মেটানোর জন্য সারা দেশে বড় আকারে ভুট্টার চাষ প্রবর্তন করতে হয়েছে, মুরগির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সারা দেশে হাইব্রিড মুরগির চাষ চালু করতে হয়েছে। এভাবে ছোট্ট একটি ব্যাপার অল্প অল্প করে হয়ে উঠেছে একটি 'জাতীয় ঘটনা'। এভাবে শুধু ঋণগ্রহীতারা যে লাভবান হয়েছেন তা নয়, গোটা দেশের অর্থনীতিতেই নিত্যনতুন উপকারী কার্যক্রম যোগ হওয়ায় দেশ লাভবান হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র-নিরন্ন মানুষের জীবন-মান উন্নত করতে যখনই যে কাজ করতে হবে বলে মনে করেছেন, তা সফল করে তোলার জন্য তিনি তাঁর প্রতিটি পর্যায়কে দেখে, বুঝে, বিশ্লেষণ করে এমন একটি অব্যর্থ রূপরেখা তৈরি করেছেন, যাতে তা কিছুতেই ব্যর্থ হতে না পারে। এই রূপরেখা তৈরিতে যা তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন তা হলো তাঁর মানবিক হৃদয় ও বাস্তব বুদ্ধি। ফলে একই সঙ্গে তা যেমন হয়েছে বিশাল, তেমনি হয়েছে নির্ভুল ও নমনীয়।

ঢাকার মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার যেন প্রতিষ্ঠানটির বিশালত্ব প্রকাশ করছে। ছবি : প্রথম আলো

৫.

ব্র্যাক কেন এত বড় ও দক্ষ হয়ে উঠল তার আরও কিছু কারণ রয়েছে। আগেই বলেছি, ব্র্যাক সামাজিক বেদনা থেকে জেগে উঠলেও সব সময় এটি পরিচালিত হয়েছে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের আদলে। সব প্রতিষ্ঠানের শরীরেই তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষা, রুচি, বিশ্বাস বা স্বপ্নের প্রভাব থাকে। তাঁর ব্যাপারেও ভিন্ন কিছু হয়নি। তাঁর শিক্ষা ও পেশা ব্যবসাকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগতভাবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তিনি। উৎপাদনের পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াগুলো তাঁর পুরোপুরি জানা। এসবের ফলপ্রসূতায় তাঁর আস্থাও নিরঙ্কুশ। ফলে সহজেই তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে দেশের মানুষের কল্যাণ কার্যক্রমে এই হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করলে অনেক বেশি মানুষের উপকার তিনি করতে পারবেন। পুঁজিবাদ যা করে ব্যক্তিস্বার্থে, তিনি তা-ই করলেন সামাজিক স্বার্থে। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডকে দক্ষ ও সক্ষম করে তুলতে এর ভেতর পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতিযোগিতা, টার্গেট ও জবাবদিহির ধারণাকে প্রায় পুরোপুরি প্রয়োগ করলেন। এতে ব্র্যাক জাতীয় স্বপ্নের পতাকা হয়তো হয়নি, কিন্তু সংগঠন হিসেবে মজবুত ও নিরঙ্কুশ হয়েছে। এক অতিকায় নির্ভুল যান্ত্রিক গ্রহের মতো দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থেকে নিঃশব্দে দেশ ও মানুষের উপকার করেছে।

৬.

ব্র্যাক কেন এমন অতিকায় হতে পারল তার কারণ নিয়ে অনেক সময় নানা কথা মনে এসেছে। এমনও তো হতে পারে যে ব্র্যাক একসময় বেশি রকম বড় হয়ে উঠলে এর প্রতিষ্ঠাতা সংগঠনটিকে দীর্ঘায়ু দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করেছিলেন। তিনি টের পেয়েছিলেন, যে বৈদেশিক সহযোগিতা দিয়ে সংগঠনটি গড়ে উঠেছে, সেই ভাঁড়ার একসময় রিক্ত হয়ে যাবে। এর সমাধান হিসেবে তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তিনি তা-ই করেছেন। তাঁর জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিগুলোর পাশাপাশি বেশ কিছু লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং তা হয়তো এ আশায় যে এদের আয় দিয়ে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখা যাবে। এর ফল ব্র্যাকের জন্য ইতিবাচক হয়েছে, ব্র্যাক বড় হয়েছে। কিন্তু মনে হয় ব্যাপারটি একটা জায়গায় এ প্রতিষ্ঠানের কিছুটা ক্ষতিও করেছে। জনকল্যাণধর্মী ব্র্যাকের ভাবমূর্তি এতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এটি ঝুলে রয়েছে জনকল্যাণধর্মী ও ব্যবসাধর্মী প্রতিষ্ঠানের মাঝামাঝি জায়গায়।
পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের মানুষ আছে যারা দেয়; এক ধরনের মানুষ আছে যারা নেয়। আমার ধারণা, যে দেয় তার যেমন দিয়ে যাওয়াই ভালো, তেমনি যে নেয় তার নেওয়াটাই সই। তবে কোনো একজনের মধ্যে যে বিপরীতধর্মী প্রবণতা থাকতে পারবে না, তা নয়। তবে তাও কিছুটা সতর্কভাবে হলেই ভালো। যে নেয় তার মধ্যে একই সঙ্গে যদি দাতা মানুষটিও থাকে, তবে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। পৃথিবীর সেবা দানবীরেরা এই দলের।

৭.

এবার তাঁর ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে দুয়েকটা কথা বলি। আমি এক জায়গায় লিখেছি, একটা জাতির সেরা মানুষেরা জন্মায় সেই জাতির মানুষদের গড়পড়তা স্বভাবের বিরুদ্ধতা করে। লক্ষ করে দেখেছি, অনেক ব্যাপারেই তাঁর স্বভাব গড়পড়তা বাঙালির উল্টো। কথার ফুলঝুরিসর্বস্ব বাঙালি হয়েও তিনি মিতবাক। কথা ব্যাপারটিকে তিনি সব সময় ছাড়িয়ে যান কাজ দিয়ে। তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গোলাম মোর্তোজা

লিখেছেন, 'প্রশ্ন না করলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর মেলে না।' আত্মপ্রচার এ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু তিনি আত্মপ্রচারহীন। সব বাঙালির মতো তিনিও কবিতা ভালোবাসেন কিন্তু কবিতার উচ্ছল ফেনিলতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর মধ্যে আগ্রহ প্রবল কিন্তু সে আগ্রহ নিঃশব্দ। আত্মসর্বস্ব বাঙালির মধ্যে তিনি পুরোপুরি পরসর্বস্বতায় প্রোথিত। তিনি প্রতিভাবান মানুষ কিন্তু তাঁর চেহারা প্রতিভাবানদের মতো জ্বলজ্বলে নয়। বিপুল কর্মযজ্ঞের নেতৃত্বে থেকেও তিনি নিম্নকণ্ঠ। প্রতিভা তাঁর মধ্যে আছে, কিন্তু তা একেবারেই মৃদু ও নিরীহ অবয়বে। বার্নার্ডশ লিখেছেন, কমন সেন্স ইজ দ্য মোস্ট আনকমন থিং। তাঁর মধ্যে এই কমন সেন্স রয়েছে খুবই উঁচু মাপে। সহজে যুদ্ধের মাঠের বিখ্যাত সেনাপতিদের মতো তিনি উপস্থিত সমস্যার অনায়াস সমাধান দিতে পারেন।

৮.

এবার কয়েকটা হালকা স্মৃতি দিয়ে এ পর্ব শেষ করি। সেদিন তাঁর বাসায় বেশ জমকালো আসর বসেছে। গল্পের একপর্যায়ে তাঁর প্রয়াত স্ত্রী শিলু আবেদ হাসতে হাসতে বললেন, যেদিন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মারা যাবে, সেদিন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র উঠে যাবে। আমি হেসে জবাব দিলাম, যেদিন ফজলে হাসান আবেদ মারা যাবেন, সেদিনও ব্র্যাক উঠে যাবে। আবেদ ভাই কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার পর আপনার প্রতিষ্ঠান উঠে যাবে কেন?

বললাম, টাকা নেই বলে। আমরা এখনো কর্মীদের দুবেলা খাবার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমি মরে গেলে টানাটানি আরও বাড়বে। তাদের পেট চোঁ চোঁ করবে। একসময় তারা চলে যাবে।

উনি বললেন, আমি তো খাওয়ার ব্যবস্থা দিতে পেরেছি। আমারটা উঠবে কেন?

বললাম, খাওয়ার ব্যবস্থা পেলে মানুষ আবার খাওয়া-খাওয়িটাও শিখে যায় কিনা।

শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

আরেকটা গল্প মনে পড়ছে। সে-ও বছর ত্রিশেক আগের কথা। সস্ত্রীক তিনি বেড়াতে এসেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমরা সব সময়েই কিছুটা দিলদরিয়া। অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে আরও। আমরা 'কেন্দ্রে'র উঠানে বসে গল্প করছিলাম। নাশতা এল—লুচি, তরকারি, নারকেলের নাড়ু, চিড়া ভাজা এসব। খাবারের বহর দেখে আবেদ ভাই বললেন, আপনাদের খাওয়াদাওয়া তো বেশ। আমরা তো এক কাপ চা দিয়েই অতিথিদের বিদায় করি। তখন ব্র্যাকের ওরাল স্যালাইনের দেশব্যাপী প্রচারণা চলছে। তার স্লোগান, 'এক চিমটি নুন, এক মুঠো গুড়।' আমি ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলকে চিমটির মতো চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললাম, আপনাদের স্লোগান হলো এক চিমটি নুন আর এক মুঠো গুড়। আর আমরা বসেছি তাজমহল বানাতে। এক কাপ চা দিয়ে কি ওটা বানানো যাবে? দেখলাম কথাটা আবেদ ভাই উপভোগ করলেন।

৯.

স্বাধীনতার পর আমাদের জাতির সংগঠন যুগের প্রথম পর্বে শুরু হয়েছিল এনজিওদের (বেসরকারি সংস্থার) যুগ। দেশ তখন একেবারেই দরিদ্র; পুরোপুরি নিম্ন আয়ের। এই সময় দেশকে টিকিয়ে রাখতে বা আধুনিক

চিন্তাচেতনার দিকে এগিয়ে দিতে এদের অবদান অনেক। এদের শতকরা নিরানব্বই ভাগই গড়ে উঠেছিল বৈদেশিক অর্থে। দেশের সেই দুর্দিনে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো আমাদের পায়ের ওপর দাঁড় করানোর জন্য সরকারের পাশাপাশি এই সংগঠনগুলোকেও দুহাত উজাড় করে সাহায্য দিয়েছে। সে সময় এই উৎস ছাড়া জনকল্যাণের আর কোনো অর্থসূত্রও দেশে ছিল না। এর ওপর ভিত্তি করে গত শতকের সত্তরের দশক থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে দেশে গড়ে ওঠে কয়েক হাজার ছোট-বড় এনজিও। এর অধিকাংশই যে নির্ভেজাল জনস্বার্থের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল তা নয়, তবু এর একটা বড় অংশ দেশের কল্যাণমুখী অগ্রযাত্রায় সেদিন বড় ভূমিকা নিয়েছে।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশ নিঃসীম দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের অতল গহ্বর ছেড়ে মধ্য আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। ফলে আমাদের জন্য উন্নত দেশগুলোর সহানুভূতিজাত বৈদেশিক সাহায্যের সম্পন্ন উৎস এখন শুকিয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। যে এনজিও-সংস্কৃতি তিন দশক ধরে আমাদের সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের অঙ্গনকে সরগরম করে রেখেছিল, ধরে নেওয়া যায়, তা হয়তো এর ফলে দ্রুতই পাণ্ডুর হয়ে আসবে।

ব্র্যাক এই পরিস্থিতিতে কোন নতুন পরিচয় নিয়ে নবজন্ম নেবে বলা মুশকিল। তবে চার-চারটি দশক ধরে ফজলে হাসান আবেদ তাঁর গড়ে তোলা এই এনজিওটির সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, বহুমুখী কর্মকাণ্ড, অসাধারণ দক্ষতা ও সুগভীর দেশপ্রেমের মাধ্যমে দেশের দুঃখী মানুষের অশ্রুমোচনে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, আমাদের জাতি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে বলেই মনে করি।

(সংক্ষেপিত)

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

© স্বত্ব প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৭
সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভেনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬, ইমেইল : info@prothom-alo.info